শীর্ষ খবর

আহমাদ ইশতিয়াক

বৃহস্পতিবার মে ২০, ২০২১ ০৬:৩৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ আপডেট: বৃহস্পতিবার মে ২০, ২০২১ ০৭:৪৪ অপরাহ্ন

পড়তে পারেন

১ স্থিতিশীলতাই এখন সবচেয়ে জরুরি

২ বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের হার কীভাবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে ছাড়িয়ে গেছে?

৩ ওয়ান টাইম প্লাস্টিকের কাপে চা-কফি খাওয়া কতটা ক্ষতিকর?

৪ জিংকসমৃদ্ধ খাবার কেন প্রয়োজন, উৎস কী

৫ রাজস্ব ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি খরচ সুদ পরিশোধে

৬ কমেছে ব্যাংক ঋণ, সংকটে ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তারা

মুক্তিযুদ্ধ

২০ মে ১৯৭১: চুকনগর গণহত্যা

চুকনগর গণহত্যা স্মৃতি স্তম্ভ। ছবি: সংগৃহীত

আচ্ছা বলুন তো মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে এক প্লাটুন সৈন্যের পক্ষে কতো মানুষকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা সম্ভব? ভাবছেন হয়তো ৩০০ থেকে ৪০০ মানুষ, আরও বেশি হলে ৬০০ কিংবা ৭০০! তারচেয়ে বেশি হলে হাজার খানেক! না সংখ্যাটা এতো কম নয়। সংখ্যাটা প্রায় ১২ হাজারের মতো!

মুক্তিযুদ্ধের ২০ মে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগরে পাকিস্তানি হানাদারেরা চালিয়েছিল এই পৈশাচিক গণহত্যা।

পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতা ও অত্যাচারের মুখে প্রাণের ভয়ে খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, ফরিদপুর, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, শরণখোলা, মংলা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, চালনার লাখ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের উদ্দেশ্য তখন খুলনার ডুমুরিয়া হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছানো। উদ্দেশ্য একটাই ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়া। ভারতীয় সীমান্তে পাড়ি জমাতে হলে ডুমুরিয়া পর্যন্ত ভদ্রা নদী দিয়ে নৌকায় আসা ছিলো অপেক্ষাকৃত অনেকটাই সহজ । কারণ এরপর সাতক্ষীরা হয়ে ভারতীয় সীমান্ত। কারণ এদিকে নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা, অনেকটা নিরুত্তাপ। এখানে হানাদার বাহিনীর আনাগোনা নেই বললেই চলে। আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগরের চারপাশ তখন নিচু এলাকা। কেবল চুকনগর বাজারটা তখন খানিকটা উঁচু।

চুকনগরে প্রবাহমান ভদ্রা নদী। ২০ মে, ১৯৭১ যে নদী হয়েছিল রক্ত গঙ্গা। ছবি: সংগৃহীত

এপ্রিল ও মে মাসে দক্ষিণাঞ্চল হিন্দুদের উপর পাকিস্তানি হানাদারদের নির্যাতন ও গণহত্যা চরম পর্যায়ে পৌঁছালো। হিন্দু নরনারীদের বসবাস তখন যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে। দক্ষিণাঞ্চলের নানা প্রান্ত থেকে আসা শরণার্থী হয়ে পাড়ি জমানো

The Daily Star | English

Chief adviser holds high-level meeting to review law and order

The chiefs of three services and several advisers were in attendance, among others

1h ago

Govt assures considering demands of protesting NBR officials

43m ago

মানুষের ঢল তখন চুকনগর হয়ে সীমান্ত মুখী। চুকনগর বাজার তাই বেশ পরিচিত। তিন দিক থেকে নদী ঘেরা চুকনগর বাজার। ভদ্রা নদী দিয়ে নৌকা করে আসা মানুষের একমাত্র বিশ্রামস্থল এই বাজার। কারণ এরপর একটানা বিরামহীনভাবে চলে সীমান্তের দিকে। চুকনগর বাজারে এলে মানুষ নৌকা থেকে নেমে রান্নাবান্না করে, শেষ সদাইটুকু করে নেয়, কেউবা জিরিয়ে নেয়। অতঃপর সীমান্তের দিকে যাত্রা। মে মাসের আগ পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় প্রত্যাশী শরণার্থীদের ভিড় অবশ্য কম ছিল। এদিকে এই পথের সুবিধার কথা ভেবে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে লাগলো। কিন্তু ১৮ এবং ১৯ মে যেন জনস্রোতের সব সীমা ছাড়িয়ে গেল। হাজারে হাজারে মানুষ আসছে, চুকনগরের আশপাশে তখন মানুষের স্রোতে যেন মেলার মতো। মানুষ আসছে, খানিক বিশ্রাম নিয়ে কিংবা রাত কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। পাকিস্তানি হানাদারদের এখানে চিহ্ন মাত্রও নেই। ওরা তখন জানে না এখানে এতো মানুষের ঢল নেমেছে।

তখন আটলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন গোলাম হোসেন। শান্তি বাহিনীর সদস্য চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন ও ভদ্রা নদীর খেয়া ঘাটের ইজারাদার শামসুদ্দিন খাঁ নামের এক বিহারী ১৯ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাতক্ষীরা ক্যাম্পে যোগাযোগ করে বললেন, চুকনগর বাজারের বর্তমান অবস্থার কথা। হিন্দুদের ঢল নেমেছে চুকনগরে। পাকিস্তানি ক্যাম্পে যোগাযোগ করার পরে হানাদারেরা খবর পেয়ে একটি ট্রাক ও একটি জিপে করে সেনা পাঠায়। এর আগে ১৯ মে অর্ধ লক্ষের বেশি মানুষ চুকনগরের পাতখোলা বিল, চুকনগরের কাঁচাবাজার, মাছবাজার, কাপুড়িয়া পট্টি, গরুহাটা, বাজারের কালী মন্দির, বটতোলাসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। তখনো মানুষ কেবলই আসছিল নানা প্রান্ত থেকে। উদ্দেশ্য এখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালেই সীমান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা। এসময় মানুষের ভিড়ে চারদিক গমগম করছিল। কেউ রান্না করছে, কেউ সওদাপাতি কিনছে, কেউ সঙ্গে আনা পলিথিনের আস্তরণ দিয়ে তাঁবু বানিয়ে নিচে অবস্থান নিয়েছেন। কেউ আশংকায় রাত্রি কাটিয়েছেন নির্ঘুম চোখে, কারণ একটা চাপা আতঙ্ক কাজ করছিল অনেকের মধ্যে।

২০ মে ১৯৭১, আজকের মতো সেদিনের দিনটিও ছিল বৃহস্পতিবার। আগের সারা রাত হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে, নৌকায়, গরুর গাড়ি করে এসেছে চুকনগরে। উদ্দেশ্য সকালের আলো ফুটলেই রওনা দেয়া। ভোর হতেই চারপাশ জেগে উঠলো। মানুষের স্রোত তখন সীমান্তের পানে। পায়ে হেঁটে সীমান্তের দিকে যাচ্ছে মানুষ, কেউ মালপত্র গোছাচ্ছে, কেউ রান্না চাপিয়েছে। কারো রান্না হয়ে গেছে, অনেকে রওনা দিয়ে দিয়েছে সীমান্তের উদ্দেশ্যে, অনেকে মাত্র খেতে বসেছে কেবল।

যেভাবে শুরু হলো গণহত্যা

বেলা তখন সাড়ে ১১টা বাজে। ঠিক এমন সময়েই সাতক্ষীরা থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ১টি ট্রাক ও ১টি জিপ চুকনগর- সাতক্ষীরা সড়ক ধরে মালতিয়া মোড়ের ঝাউতলায় এসে থামে। এসময় রাস্তার পাশে পাট খেতে কাজ করছিলেন মালতিয়া গ্রামের চিকন আলী মোড়ল নামে একজন। তিনি গাড়ির শব্দে উঠে দাঁড়ালে পাকিস্তানি হানাদারেরা তাকে দেখে গুলি করতে গেলে তিনি হাতের কাস্তে ছুঁড়ে মারেন হানাদারদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশফায়ার। এরপর একই গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ কুন্ডুকেও গুলি করে মারা হয়।

এরপর পাতখোলা বাজারে ঢুকে গণহারে নিরীহ মানুষদের লাইনে দাঁড়িয়ে গণহত্যা শুরু করে হানাদারেরা। পাকিস্তানি হানাদারেরা ভাগ হয়ে এক দল পাতখোলা বিল থেকে চাঁদনী, ফুটবল মাঠ, চুকনগর স্কুল, মালতিয়া, রায়পাড়া, দাসপাড়া, তাঁতিপাড়া, ভদ্রা ও ঘ্যাংরাইল নদীর পাড়ে জমা হওয়া মানুষের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। চুকনগরের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে অস্ফুট আর্তনাদ, মৃত্যু যন্ত্রণা। প্রাণ বাঁচাতে মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও হালকা মেশিনগানের অবিরাম গুলিতে ধ্বংসলীলা নেমে এসেছিলো এই জনপদের বুকে। ভদ্রা নদীর জল সেদিন লাল টকটকে রক্তে ভেসে গিয়েছিল। কোথাও লাশের কারণে নদী পথ আটকে গেছে। সেদিন যারা সাঁতরে নদীর ওপাড়ে পৌঁছাতে পেরেছিল, তারাই বাঁচতে পেরেছিল।

সকাল সাড়ে ১১টায় শুরু হওয়া পাকিস্তানি হানাদারদের এই গণহত্যা গুলি ফুরিয়ে আসার কারণে থামলো দুপুর তিন টায়। চার মাইল ব্যাপী চলা এই নিষ্ঠুর গণহত্যায় শহীদদের প্রকৃত সংখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন প্রায় ১২ হাজারের মতো নিরীহ মানুষ।

এই গণহত্যায় প্রকৃত সংখ্যা না পাওয়ার কারণ নদীর পানিতে প্রথমে অজস্র লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে আঞ্চলিকভাবেও উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি কারণ

গণহত্যায় শহীদ বোশরভাগ মানুষ ছিলেন চুকনগর কিংবা ডুমুরিয়া ও খুলনার বাইরের অঞ্চলের। বিশেষ করে বাগেরহাট বরিশাল, ফরিদপুর, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, শরণখোলা, মংলা, দাকোপসহ নানা জায়গা থেকে যারা এসেছেন তাদের স্বজনদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। কারণ স্বজন পরিজনেরা ভেবেছিলো তারা হয়তো নিরাপদে ভারতে পৌঁছে গেছেন, মুক্তিযুদ্ধের পর আর ফিরে আসেননি।

চুকনগর গণহত্যা থেকে বেঁচে ফেরা গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের গণহত্যার বিবরণী

খুলনার বটিয়াঘাটার উত্তর বাঙ্গিমারি গ্রামের বলাই গোলদার বলেন, ‘হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে চুকনগর কলেজের ভিতরে আমাদের একটি মেয়ে হয়। ওদের পরিষ্কার টরিস্কার করে যখন ভারত যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে উঠিয়ে দিই তখন দক্ষিণপাশ থেকে গুলি শুরু হয়। বাসওয়ালা ওদের নামিয়ে দিয়ে বাস নিয়ে চলে যায়। তখন একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থা হলো। কাউকে খুঁজে পেলাম না। আমি কাঁদতে লাগলাম। গুলি চললো আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। সবাইকে খুঁজে ফিরছি, কাউকে পাইনা...। সেদিনের কথা কি বলবো আর! একজনের পেটের ভুঁড়ি আরেকজনের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। এখানে সেখানে বহু লোক মেরেছে, ২০ হাজারের উপরে হবে।’

চুকনগর গ্রামের আনসার আলী সরদার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলেছিলেন, ‘শুধু আমরা ৪২ জনই ২১টি বাঁশে করে লাশ ঠেলে নদীতে ফেলেছিলাম। প্রতিবার ২০০টি করে লাশ। ২১ মে ভোর থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত লাশ ফেলেছি।’

চুকনগরের কৃষক গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী আফসার আলী সরকার বলেছিলেন, ‘সকালবেলা একখানা মিলিটারি গাড়ি আসলো। আমাদের বললো লাশ ফেলানোর জন্য। এক হিন্দু বাড়ি থেকে বাঁশ নিলাম। বাঁশ নিয়ে বেশ খাটো খাটো করে এপাশ বেঁধে দুই জনে মিলে আমরা ৯টা/ ১০টার দিকে নদীতে লাশ ফেলতে শুরু করলাম। আমার সাথে ছিল আমার বেয়াই ইনসার আলী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লাশ ফেললাম। প্রথমে গুনেছি তারপর গুনিনি। অগণিত লাশ ফেললাম। রাতে বাড়ি এসে গোসল করে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনে কম করে হলেও আমরা ৫ থেকে ৬ হাজার লাশ ফেলেছি।’

চুকনগরের পাশের গ্রাম রুস্তমপুর নিবাসী শিক্ষক সরদার মুহাম্মদ নূর আলী বর্ণনা দিয়েছিলেন চুকনগরের গণহত্যার পরবর্তী সময় নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, "সে এক করুণ নারকীয় দৃশ্য ভোলা যায় না। আমাদের এলাকায় প্রায় চার মাইল ব্যাপী এই হত্যাযজ্ঞ চলেছে। লাশগুলো কিছু নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। দুর্গন্ধ এড়াতে কিছু লাশ মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল। এলাকার লোক ২ মাস পর্যন্ত ওই নদীর মাছ খায়নি। ভয়ে লোকজন পাঁচ ছয় মাস পর্যন্ত বাজারেও আসেনি।"

চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও চুকনগরের বাসিন্দা ইয়াকুব আলী সরদার হামুদুর রহমান কমিশনের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ২৬ হাজারের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘২৬ হাজার মানুষ মরেছে তারা হিসেব করে, আমাদের এখানে মেরেছে তো ১০ হাজারের বেশি!

ডুমুরিয়ার মাগুরখালী ইউনিয়নের পরমাওয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা, চুকনগর গণহত্যা থেকে বেঁচে ফেরা, গণহত্যা প্রত্যক্ষদর্শী দেবাশীষ রায় বলেছিলেন, 'আমরা আসার এক দেড় ঘণ্টা পর খান সেনারা গাড়ি করে আসে। খান সেনাদের দেখে লোকজন ভয় পেয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে। বাবাসহ আমরা ছিলাম নৌকার এক সাইডে। ওরা সবাইকে লাইন দিতে বলল লাইন দেয়ার একটু পরে গুলি শুরু করলো বহু লোকজন মারা পড়লো। আনুমানিক ১০ থেকে ১১ হাজার লোককে হত্যা করেছিল। আমার বড় ভাই মেজ কাকা সেজ কাকাকে লাইনে গুলি করে মারলো। আমার মার'ও বামপাশে গুলি লাগে। বাবা আর সহ্য করতে না পেরে বললেন, "তোরা যেটা ভালো বুঝিস তাই কর। আমি আর বেঁচে থেকে কি করবো। আমার ভাই গেল, ছেলে গেল, স্ত্রীও যাওয়ার পথে।” আমরা খুব অনুরোধ করলাম। শুনলো না চলে গেল। পরে বাবাকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে।'

গণহত্যার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি ফুল

চুকনগর গণহত্যায় অজস্র শিশু হারিয়েছিল তাদের বাবা মা কে। অনেক নবজাতককে চুকনগরসহ আশপাশে বহু গ্রামের মানুষ লালনপালন করেছিলেন। এর মধ্যে এমনই এক শিশু ‘সুন্দরী’।

এই গণহত্যার পরদিন তথা ২১ মে সকালে বর্তমান চুকনগর কলেজের সামনে পাতখোলা বিলে বাবা চিকন আলী মোড়লের লাশ খুঁজতে গিয়েছিলেন এরশাদ আলী মোড়ল। এসময় লাশের স্তূপের মধ্যে মৃত মায়ের স্তন থেকে দুধপানরত ৬ মাস বয়সী

এক শিশুকন্যাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে যান তিনি। তিনি নাম রেখেছিলেন সুন্দরী। এদিকে সুন্দরীর মায়ের কপালে সিঁদুর ও হাতের শাঁখা দেখেছিলেন এরশাদ আলী মোড়ল। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে এক হিন্দু পরিবারেই বড় করিয়েছেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে সুন্দরী বলেছিলেন, "চুকনগর বধ্যভূমিতে গেলে আজও বুকটা হাহাকার করে ওঠে। খুঁজে ফিরি মা-বাবাকে। কিন্তু আমি তো জানি না আমার পৈত্রিক বাড়ি কোথায়। শুধু জানি, বাঁচার আশায় আমার পরিবার এখানে এসেছিলো।"
মুক্তিযুদ্ধের ২০ মে আজকের দিন সংগঠিত হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গণহত্যা চুকনগর গণহত্যা। চুকনগর গণহত্যা দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি শহীদদের।

তথ্যসূত্র-

১৯৭১ চুকনগরে গণহত্যা/ সম্পাদনা- মুনতাসীর মামুন

চুকনগর গণহত্যা/ মুনতাসীর মামুন

আহমাদ ইশতিয়াক ahmadistiak1952@gmail.com

আরও পড়ুন-

১৭ মে ১৯৭১: কাঠিপাড়া ও শিবচর গণহত্যা

১৬ মে ১৯৭১: যুগীশো, পালশা ও হাসামদিয়ায় গণহত্যা

১৫ মে ১৯৭১: পাথরঘাটা ও কেতনার বিল গণহত্যা

১৪ মে ১৯৭১: বাড়িয়া ও নড়িয়ায় গণহত্যা

১৩ মে ১৯৭১: ডেমরা ও সাতানিখিলে নির্মম গণহত্যা

১২ মে ১৯৭১: সাতবাড়িয়া গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক তৎপরতাময় দিন

Available on the App Store
GET IT ON Google Play
Click to comment

© 2025 thedailystar.net | Powered by: RSI LAB
Copyright: Any unauthorized use or reproduction of The Daily Star content for commercial purposes is strictly prohibited and constitutes copyright infringement liable to legal action.